International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VI, Issue-V, September 2020, Page No. 50-57
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.6.issue.05W.068

অর্থশাস্ত্রে কথিত প্রাচীন ভারতের বিবাহ প্রথা এবং আধুনিক সমাজে তার প্রভাব

অনিমা সাহু
স্বতন্ত্র গবেষক, সংস্কৃত বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

*From the ancient periods it has been seen that marriage is a very important part of human life. It is the process by which two people make their relationship public, official and permanent. Marriage system has been carefully discussed in '**Veda**', '**Dharmashastra**', '**Smriti**', '**Epic**' etc. At the time of Vedic era the purposes of marriage were to enable a man by becoming a householder, to perform sacrifice to the Gods and to producing sons. The importance of marriage has been focused in Kautilya's **'Arthashastra'**. At that time society was allowed eight types of marriages such as **'Brahma'**, **'Daiva'**, '**Arsha**', '**Prajapatya**', '**Gandharva**', '**Asura**', '**Rakshasa**' and '**Paishaca**'. Among them first four marriage systems were given more priority and according to Kautilya these four systems were known as '**Dharma Vivaah'**. After marriage, the duties and responsibilities of men-women and their family members have been well mentioned in **'Arthashastra'**. The rules and laws regarding '**Stridhana**' (women's property), widow marriage and remarriage have been exhaustively elaborated in '**Arthashastra'**. In this research work we have discussed the aim of marriage in modern civilized society or its importance and effect of the ancient marriage to this modern life marriage system. Finally, conclusions have been drawn at the end of this paper.*

Keywords: Arthashastra, Stridhana, Dharma Vivaah, Kautilya, remarriage, widow marriage.

ভূমিকা : সুপ্রাচীন কালের রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক একটি গ্রন্থ হল কৌটিল্য রচিত 'অর্থশাস্ত্র'। প্রাচীন ভারতের তথ্যানুসন্ধানে যে সমস্ত গ্রন্থ গুলি আমাদের সহায়তা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো এই গ্রন্থটি। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত এই অসামান্য গ্রন্থটি চিন্তার গভীরতা, বাস্তবমুখীনতার সমন্বয়ে দেশ কালের সীমাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন সমাজে সমাদর লাভ করেছে।

'অর্থশাস্ত্র' নামটি থেকেই সাধারণ ভাবে মনে হবে শুধুমাত্র অর্থবিষয়ক আলোচনা ই এখানে রয়েছে, কিন্তু এর বিষয়বস্তু অর্থনীতি বিদ্যা থেকে অনেক বেশি ব্যাপক। ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে কৌটিল্য অর্থের প্রাধান্য স্বীকার করেছেন কারন ধর্ম ও কাম- এই দুটি অর্থের দ্বারাই সাধিত হয়- 'অর্থ এব প্রধান ইতি । কৌটিল্যঃ

অর্থমূলৌ হি ধর্ম কামাবিতি'[১]। অর্থ বলতে তিনি শুধু সম্পদ কে বোঝান নি। তাই সম্পদ ও সম্পদের উপোযোগী মনুষ্যগণ যে পৃথিবীতে বাস করে তার রক্ষণ,পালন প্রভৃতি বিষয়গুলি তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।[২] 'অর্থশাস্ত্র'গ্রন্থটি মূলতঃ রাজ্যশাসন,রাজ্যজয়,রাজ্যরক্ষা, দণ্ডনীতি বিষয়ক এককথায় রাজনৈতিক গ্রন্থ হলেও সেই সময়ের ভারতের সমাজব্যবস্থারকেমন ছিল তার একটি সুন্দর চিত্র এখানে পাওয়া যায়।

বৈদিক যুগের সমাজ, পরিবেশ, অর্থনীতি, নিয়ম শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিষয়গুলি বেদে, ব্রাহ্মণগুলিতে ও অন্যান্য বৈদিক সাহিত্যে আলোচিত হয়েছে। পরবর্তী কালে এসব বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিশদভাবে পর্যালোচনা দেখা যায়। এইসব বিষয়বৈচিত্রের দিক থেকে বিচার করলে 'ধর্মশাস্ত্র'ও'অর্থশাস্ত্র'-এর মধ্যে অনেক মিল পাওয়া যায়।কিন্তু অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্মশাস্ত্রের পরিসর অনেক ব্যাপক । কিন্তু দুটি শাস্ত্রের এই সাদৃশ্য থাকার জন্য যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় 'মিতাক্ষরা' ভাষ্যে অর্থশাস্ত্র কে ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত রাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বলা হয়েছে- 'ধর্মশাস্ত্রান্তর্গতমেব রাজনীতীলক্ষণমর্থশাস্ত্রমিদং বিবক্ষিতম্।'[৩] কিন্তু এত মিল থাকলেও ধর্মশাস্ত্র কে বেশি বলবান মনে করা হয়।[৪]

ষড়্ বেদাঙ্গের অন্যতম কল্প -এর অন্তর্ভুক্ত শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্রে বিভিন্ন রকমের আচার-অনুষ্ঠান-সংস্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন শাস্ত্রে এই সংস্কারাদি বিষয়গুলির পর্যালোচনা দেখে মনে হয় 'সংস্কার' কথাটির মধ্যে যেন পবিত্রতা বিষয়টি নিহিত রয়েছে। শাস্ত্রকাররা মনে করতেন মানুষ জন্মের পূর্বে গর্ভে থাকাকালীন অবস্থা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নানারকম পাপকর্মে লিপ্ত হতে পারে এবং এইসব সংস্কারের মাধ্যমে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব হবে। কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তাতে সমাজে বসবাসকারী প্রত্যেকটি মানুষের কর্তব্যাকর্তব্য, তাদের আচার ব্যবহার এর বিষয়গুলি হয়েছে। সে সময়ে সমাজে নানারকম সংস্কার এর প্রচলন ছিল । বর্তমানে তার সবগুলি পাওয়া যায় না।যত দিন গেছে সেইসব সংস্কার লুপ্ত হতে হতে বর্তমানে কয়েকটি মাত্র দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ শাস্ত্রে ষোড়শ সংস্কারের কথা উল্লেখ আছে। ষোড়শ সংস্কারের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হল বিবাহ সংস্কার। অর্থশাস্ত্রের যুগে অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে সমাজে বিবাহ বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল অর্থাৎ বিবাহ বিষয়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেটি আলোচনা করে বর্তমান সময়ে বিবাহ সংস্কারটির ওপর তার কতটা প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ কোনো মিল আছে কিনা বা নতুন কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আলোচ্য গবেষণাপত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়েছে।

অর্থশাস্ত্রে বিবাহ প্রথার স্বরুপ : প্রাচীন ভারতের সমাজে চতুরাশ্রম ব্যবস্থার প্রচলন ছিল।সেগুলি হল- ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য,বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। ব্রহ্মচর্যাশ্রমে গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করে গার্হস্থ্য আশ্রমের দ্বারা সংসার ধর্ম পালন করতে হয়।এই গার্হস্থ্য আশ্রমের সূচনা হয় বিবাহ সংস্কারটির মাধ্যমে। বিবাহ মানবসমাজের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান।যুগ যুগ ধরে এই প্রথা কে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে এসেছে প্রধানতঃ ধর্ম। বিবাহ সংক্রান্ত সমস্ত আইন কানুন তাই বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কারন ধর্মীয় আইনের দ্বারাই শাসিত হতো সমাজসংস্কার।[৫]

বিবাহ একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ। সেই কর্মযজ্ঞের পরিণতি সর্বদা সুখকর ও মঙ্গলময় হয় স্বামী স্ত্রীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা,ভক্তি এবং সর্বোপরি বিশ্বস্থতার মাধ্যমে। বৈদিক সাহিত্যে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে বিবাহ সংস্কারটিকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্র'-এর 'ধর্মস্থীয়ম্' নামক তৃতীয় অধিকরণে বিবাহের শ্রেষ্ঠতা বোঝানোর জন্য প্রথমেই বলেছেন – 'বিবাহপূর্বো ব্যবহারঃ'।[৬] অর্থাৎ সমস্ত ব্যবহারের মধ্যে বিবাহ-ই প্রথম।'বিবাহ' শব্দটি বি উপসর্গ পূর্বক 'বহ্'- ধাতুর উত্তর 'ঘঞ্',প্রত্যয় করে হয়। 'বি' উপসর্গ টির অর্থ বিশেষ প্রকারে এবং 'বহ্'-ধাতুর অর্থ বহন করা। অতএব বিবাহ শব্দটির অর্থ কন্যাকে বিশেষ প্রকারে বা বিশেষ উদ্দেশ্যর জন্য স্থানান্তরিত করা- 'বিশেষেণ বহনং বিবাহঃ'।[7] বিভিন্ন শাস্ত্রে বিবাহ শব্দের ভিন্ন ভিন্ন সমার্থক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন-উদ্বাহ, উপযম,পাণিগ্রহণ,পরিণয় ইত্যাদি। বিবাহ সংস্কারের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রত্যেকটি সমার্থক শব্দের অর্থ নির্ণয় করা হয়েছে। যেমন- 'উদ্বাহ' শব্দের অর্থ করা হয়েছে কন্যাকে পিত্রালয় থেকে নিজ গৃহে আনয়ন করার প্রক্রিয়া,

'উপযম' অর্থাৎ কন্যা কে নিজের কাছে নিয়ে এসে নিজের করে নেওয়া , 'পাণিগ্রহণ' অর্থাৎ কন্যার হস্ত প্রার্থনা করে হস্ত ধারণ করা । আবার 'পরিণয়' শব্দের অর্থ করা হয়েছে যে সংস্কারে অগ্নিকে প্রদক্ষিন করা হয়।[৮] কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্র , মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা , পরাশরসংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা ব্যাসসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে বিবাহ শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায় ।

বিভিন্ন শাস্ত্রে, সংহিতা গ্রন্থে বিবাহ শব্দটি যে নামেই প্রযুক্ত হোক না কেন অর্থগত দিক থেকে উদ্দেশ্য একই এবং একই বিষয়টিকেই বোঝায়। বৈদিক যুগ থেকে বিবাহের উদ্দেশ্য রূপে বলা হয়েছে যে নর-নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিশ্বস্ততার মাধ্যমে সাথে থাকবে ,পুত্রোৎপাদনের মাধ্যমে বংশ রক্ষা করবে, যজ্ঞকর্ম করবে এবং স্বর্গ লাভের অধিকারী হবেন। তাই বলা হয়েছে –' অপত্যং ধর্মকার্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ ।।'[৯]

বিবাহের প্রকারভেদ : প্রাচীনকাল থেকে গার্হস্থ্যজীবনের মূলভিত্তি বিবাহ। সেই সময়ে সমাজে বিবাহের ধরণ অনুযায়ী আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে। অর্থশাস্ত্র, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে এই আট প্রকার বিবাহ স্বীকার করা হয়েছে। সেগুলি হল ব্রাহ্মবিবাহ, প্রাজাপত্য,আর্ষ,দৈব ,গান্ধর্ব,আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচিক বিবাহ। অর্থশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে-'কন্যাদানং কন্যামলংকৃত্য ব্রাহ্মবিবাহঃ। সহধর্মচর্যা প্রাজাপত্যঃ। গোমিথুনাদানাদার্ষঃ।অন্তর্বেদ্যাম্ ঋত্বিজে দানাদ্ দৈবঃ।মিথঃ সমবায়াদ্ গান্ধর্বঃ।শুল্কাদানাদাসুরঃ।প্রসহ্যাদানাদ্ রাক্ষসঃ ।সুপ্তাদানাৎ পৈশাচঃ '[১০] অর্থাৎ সালংকারা কন্যাকে সম্প্রদান করা হয় যে বিবাহে সেটি ব্রাহ্মবিবাহ , যে বিবাহে বর- কন্যা যৌথ ভাবে ধর্মাচরণ করে সেটি প্রাজাপত্য বিবাহ, এক জোড়া গোরু সমেত কন্যা দান করা হয় যে বিবাহে সেটি আর্ষবিবাহ , যে বিবাহে যজ্ঞের সময় ঋত্বিক কে কন্যা দান করা হয় সেটি দৈব বিবাহ , পরস্পর অনুরাগ বশতঃ বর-কন্যার মিলন হয় গান্ধর্ব বিবাহে , কন্যার বিনিময়ে শুল্ক নেওয়া হয় যে বিবাহে সেটি আপুর বিবাহ , কন্যা কে বলপূর্বক অপহরণ করা হয় যে বিবাহে সেটি রাক্ষস বিবাহ এবং ঘুমন্ত বা মত্ত অবস্থায় থাকা কন্যাকে অপহরণ করে যে বিবাহ করা হয় সেটি পৈশাচবিবাহ ।

উপরোক্ত আটপ্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চার প্রকার অর্থাৎ ব্রাহ্ম , প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব - এই চারটি বিবাহ পিতা- মাতার অনুমতি অনুযায়ী হয় বলে কৌটিল্য এগুলিকে ধর্ম্য বিবাহ বা ধর্মানুকূল বিবাহ বলেছেন। অপর চারটি বিবাহে পিতা মাতার অনুমতি থাকে না বলে ওগুলো অধর্ম্য বিবাহ নামে খ্যাত। কিন্তু গান্ধর্ব বিবাহও ধর্ম্য বিবাহ হতে পারে যদি তাতে পিতা মাতার অনুমতি থাকে।[১১] আবার পৈশাচ বিবাহে জোর করে কন্যা কে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করা হত বলে শাস্ত্রকাররা সেটিকে ভালো চোখে দেখেননি। কিন্তু সেই সময়ের সমাজে এই ধরনের ঘটনা ঘটত এবং বিবাহ হত এটিকে একপ্রকার বিবাহ রূপে স্বীকার করা হয়েছে। কৌটিল্যও তাই এরূপ বিবাহ মেনে নিয়েছেন। এই আট প্রকার বিবাহ বিষয়ে মনু, যাজ্ঞবল্ক্যের মতামতও একই ধরনের।

বিবাহের বয়স : প্রাচীন শাস্ত্র গুলিতে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর আয়ু বা বয়স কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই শাস্ত্রকাররা নারী পুরুষের বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স নির্দেশ করে দিয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেক শাস্ত্রকার এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অর্থশাস্ত্রেও বিবাহ বিষয়ে আলোচনায় বয়সের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যর মতে - কন্যার দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রম করলে সে স্ত্রী পরিচরন কর্মে নিয়োগের যোগ্য হবে এবং স্বামীর সংসারের সমস্ত দায়িত্ব পালন করবে। আবার পাত্রের বয়স ষোল বৎসর অতিক্রম করলে তাকে সাবালক বলা হবে।এই বয়স অতিক্রম করার পরও নারী পুরুষ যদি স্ত্রী- স্বামীর কর্তব্য, আচরনে যুক্ত না হয় তবে তাদের যথাক্রমে দ্বাদশ পণ ও চব্বিশ পণ জরিমানা দিতে হয় - 'দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা ভবতি । ষোড়শবর্ষঃ পুমান্..... '।[12] আবার মনু ত্রিশ বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে দ্বাদশ বর্ষীয়া কন্যার এবং চব্বিশ বছর বয়স্ক পুরুষের সঙ্গে অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার বিবাহের কথা বলেছেন।[১৩] রামায়ণ- মহাভারতে স্বয়ম্বর বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কন্যা বয়স ও যোগ্যতা অনুযায়ী

নিজের পছন্দের পুরুষকে বিবাহ করতে পারত।পালিগ্রন্থ গুলিতে মেয়ের বিয়ের বয়স ষোল বছর বলা হয়েছে। শাস্ত্রানুযায়ী নির্দিষ্ট বয়স হলে দৈহিক সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, অনিন্দনীয় চরিত্রের, কুমারীত্ব বিশিষ্ট কন্যার সহিত সৎচরিত্র, শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, বুদ্ধিমান পাত্রের বিবাহ হওয়া উচিত।

স্ত্রীধন : বিবাহ সংস্কারটির মধ্যে কন্যা ওপাত্র পক্ষের মধ্যে দেওয়া নেওয়ার একটি প্রথা দেখা যায়। এই প্রথাটি সেই প্রাচীন কাল থেকে বর্তমানেও সমাজে প্রচলিত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় পাত্রপক্ষ কন্যার পরিবার থেকে বরপণ রূপে অর্থ, অলংকার, বহুমূল্য সামগ্রী নিয়ে থাকে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে কন্যা শুল্ক নেওয়ার প্রচলন দেখা যায় অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রে কন্যার পিতা কে শুল্ক দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়। তবে বিবাহে কন্যা পিতৃগৃহ ও পতিগৃহ থেকে , তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের কাছ থেকে অলংকারাদি ধনরত্ন লাভ করে সেগুলিকে 'স্ত্রীধন' বলা হয়। সেই স্ত্রীধনে নারীর-ই অধিকার ছিল। স্বামী কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করতে পারতেন। আবার স্ত্রী কেও প্রয়োজন বিশেষে স্ত্রীধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হত।এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রগুলিতে, অর্থশাস্ত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম উল্লেখ করা হয়েছে।

কৌটিল্য দুই প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলেছেন-'বৃত্তিরাবন্ধ্যং বা স্ত্রীধনম্'[১৪] অর্থাৎ বৃত্তি এবং আবন্ধ্য। বৃত্তি হল ভোরণ পোষণের যোগ্য সম্পত্তি এবং আবন্ধ্য হল পরিধেয় অলংকারাদি ।এই দুটি স্ত্রীধনের মধ্যে বৃত্তির পরিমাণ হবে সর্বাধিক ২০০০ হাজার পণ ।আর আবন্ধ্য বা অলংকারের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণের কথা বলা হয়নি।এই দুটিকে প্রাথমিক ভাবে উল্লেখ করা হলেও আরও অন্যান্য স্ত্রীধনের কথাও বলা হয়েছে। মনুসংহিতায় ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা উল্লেখ আছে - অধ্যগ্নি, অধ্যবাহনিক, প্রীতিদত্ত , ভ্রাতৃদত্ত ,পিতৃদত্ত ও মাতৃদত্ত।[১৫] যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায়ও ছয় প্রকার স্ত্রীধনের কথা বলা হয়েছে। অনান্য ধর্মশাস্ত্র তে এ নিয়ে নানারকম মত দেখা যায় । কিন্তু অর্থশাস্ত্রে সবগুলি আলোচনা করা হয়নি।

স্ত্রীধনের ব্যবহার বিধির নির্দিষ্ট নিয়ম কৌটিল্য নির্দেশ করছেন। নিজের ইচ্ছেমত এটি ব্যবহার করা যেত না, বিপদে- আপদে প্রয়োজনেই এর ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে । স্ত্রীধনের ব্যবহার বিষয়ে অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে - স্বামী অনুপস্থিত থাকলে সন্তানদের লালন পালনের জন্য স্ত্রীধনের ব্যবহার করা যেত। প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে বা কোনো ধর্মানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বামীর স্ত্রীধনের ওপর অধীকার ছিল । ব্রাহ্মাদি চার প্রকার ধর্ম্য বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী দুই সন্তানের জন্য যৌথ ভাবে তিন বছর স্ত্রীধন ব্যবহার করতে পারতেন । কিন্তু গান্ধর্ব ও আসুর বিবাহের ক্ষেত্রে এই ভাবে স্ত্রীধন ব্যবহার করলে সুদ সমেত ফিরিয়ে দিতে হত। আবার আবার রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহের ক্ষেত্রে এই ভাবে স্ত্রীধন ব্যবহার করলে চুরির দণ্ড দেওয়া হয় - 'গান্ধর্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিকমুভয়ং দাপ্যেত । রাক্ষস-পৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাত্ ' ।[১৬]

এই স্ত্রীধন অনেক সময় স্বয়ং নারীও ব্যবহার করতে পারতেন না। সে বিষয়ে বলা হয়েছে - যখন কোনো স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর আবার বিবাহ করে তবে পূর্বপতি থেকে প্রাপ্ত স্ত্রীধন ফিরিয়ে দিতে হত। এরূপ স্ত্রীর যদি কোনো পুত্র থাকে তবে সেই স্ত্রীধনের একমাত্র অধীকারী সেই পুত্র হবে। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর সন্তান লাভের জন্য কোনো স্ত্রী শ্বশুর কূলের অনুমতি ক্রমে যদি পুনর্বার বিবাহ করে তবে তাকে স্ত্রীধন ফিরিয়ে দিতে হত না ।একই ভাবে কোনো বিধবা রমণী পুনর্বিবাহ না করে ধর্মকর্মের দ্বারা জীবন অতিবাহিত করতে চাইলে স্ত্রীধন ভোগ করতে পারত । আবার বলা হয়েছে কোনো নারী যদি রাজার প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে , দর্পবশতঃ মদ্যপান করে , উদ্যানক্রীড়াদিতে গমন রূপ অতিচার করে , স্বামীর থেকে দূরে চলে যায় সেই নারীর স্ত্রীধনে কোনো অধিকার থাকবে না ।

স্বামী জীবিত অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু হলে তার পুত্র কন্যা দের মধ্যে স্ত্রীধন ভাগ করে দেওয়া হবে। নিঃসন্তান নারীর স্ত্রীধন তার স্বামী ভোগ করতে পারতেন। তবে মৃতা স্ত্রীর অন্বাধেয় অর্থাৎ পিতৃগৃহ থেকে আনীত স্ত্রীধন তাদেরই ফিরিয়ে দিতে হত-'জীবিতি ভর্তরি মৃতয়াঃ পুত্রা দুহিতরশ্চ স্ত্রীধনং বিভজেরন্ ।অপুত্রায়া দুহিতরঃ । তদভাবে ভর্তা । শুল্কমন্বাধেয়মন্যদ্বা বন্ধুভির্দত্তং বান্ধবা হরেযুঃ ।'[১৭]

বিধবা বিবাহ : অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীধন বিষয় টি পর্যালোচনা করলে সে সময়ে সমাজে বিধবাদের বিবাহ সমর্থন করা হত তা বোঝা যায়।যে বিধবা পুনর্বিবাহ করতেন তাকে অর্থশাস্ত্রে 'বিন্দমানা' বলা হয় এবং সেই দ্বিতীয় বিবাহ কে বলা হত ' নিবেশ' । স্বামীর মৃত্যুর পর কোনো কোনো নারী শ্বশুর কূলের অনুমতি নিয়ে আবার কেউ কেউ কোনো অনুমতি ছাড়াই নিজের পছন্দ মত পুরুষকে বিবাহ করত । শ্বশুর কূলের অনুমতি ছাড়া বিধবা নারী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে সমস্ত স্ত্রীধন পূর্ব শ্বশুর বাড়িতে ফেরৎ দিতে হত। কিন্তু কোনো বিধবা রমণী সন্তান লাভের জন্য শ্বশুর কূলের অনুমতি নিয়ে বিবাহ করলে সেই নারী স্ত্রীধন ভোগ করতে পারত। সে সময় বিন্দমানা নারীরা অন্য পুরুষ ছাড়াও মৃত স্বামীর ভ্রাতাকেও পতি রূপে গ্রহণ করতেন। তাই বলা হয়েছে - 'পতিসোদর্যং গচ্ছেত্ ।'[১৮] এক্ষেত্রে আবার একটি নিয়ম করা হয়েছে - মৃত পতির অনেক ভ্রাতা থাকলে পরবর্তী জন কে বিয়ে করতে হত বা পতির সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা যদি স্ত্রী বিহীন হয় তবে তাকেই পতিরূপে মেনে নিত। আবার মৃত পতির কোনো সহোদর না থাকলে সেক্ষেত্রে পতির বৈমাত্রেয় ভাই কে বা পতিকুলোৎপন্ন নিকট সম্বন্ধযুক্ত কোনো পুরুষকে পতি রূপে গ্রহণ করত।

পুনর্বিবাহ : ধর্মশাস্ত্রকাররা বিধবা বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বিবাহও স্বীকার করেছেন।কারন তাদের মতে কোনো নারী পতির মৃত্যুর পর বা বিচ্ছেদের পর সুন্দর ভাবে জীবন অতিবাহিত করার জন্য পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতেন । অর্থশাস্ত্রে নারী পুরুষের পুনরায় বিবাহ কে সমর্থন করা হয়েছে । বৈদিক যুগ থেকে পুরুষদের বহু বিবাহ প্রচলন ছিল জানা যায়। তবে নারীরাও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুনরায় বিবাহ করতেন তা বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে জানা যায় । নারী- পুরুষের এই পুনর্বিবাহ বিষয়ে কৌটিল্য নির্দিষ্ট নিয়ম উল্লেখ করেছেন । নারীর পুনর্বিবাহ বিষয়ে তিনি বলেছেন যে কোনো সধবা নারী প্রবাসী পতির জন্য শাস্ত্র নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করবার পর পুনর্বিবাহ করতে পারতেন । এক্ষেত্রে আবার বর্ণব্যবস্থার প্রভাব দেখা যায় অর্থাৎ কোন বর্ণের নারী তার পতির জন্য কতদিন অপেক্ষা করবেন তা বলে দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পুত্রহীনা পত্নীরা যথাক্রমে চার, তিন , দুই ও এক বৎসর পর্যন্ত অল্পকালের জন্য প্রবাসী পতির জন্য অপেক্ষা করে পুনরায় বিবাহের অনুমতি পেত । কিন্তু সেই স্ত্রী গর্ভবতী হলে যথাক্রমে আরো এক বৎসর করে বেশি অপেক্ষা করতে হবে। আবার কোনো স্বামী ভোরণ পোষণের ব্যবস্থা করে থাকলে উক্ত সময় অপেক্ষা দ্বিগুণ অপেক্ষা করে পরিবারের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হত।[১৯]

অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে - কোনো ব্রাহ্মণ স্বামী শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে বিদেশে গেলে তাঁর স্ত্রী ১০ বছর অপেক্ষা করবেন এবং তিনি যদি সন্তান যুক্ত হন তাহলে ১২ বছর অপেক্ষা করে পুনরায় বিবাহ করতেন । আবার রাজকর্মচারীরা রাজকার্যের জন্য বিদেশে গেলে তাঁর স্ত্রীরা পুনর্বিবাহ এর অনুমতি পেতেন না । তবে তিনি বংশ রক্ষার জন্য অন্য পুরুষের সন্তান ধারণ করলে তাতে কোনো দোষ হত না- 'ব্রাহ্মণমধীযানং দশবর্ষান্য প্রজাতা , দ্বাদশ প্রজাতা রাজপুরুষম্ আ আয়ুঃক্ষয়াদাকাঙ্ক্ষেত । সবর্ণতশ্চ প্রজাতা ন অপবাদং লভেত ।'[২০] এই নিয়ম শেষ চার প্রকার বিবাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। ধর্ম বিবাহ গুলির ক্ষেত্রে এই নিয়ম খাটত না।

নারীদের মতো পুরুষদের পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রেও কিছু নিয়ম আছে । কৌটিল্য বলেছেন বিবাহিতা পত্নীকে পরিত্যাগের প্রধান কারণ পুত্র লাভের প্রয়োজনীয়তা । পুত্র লাভের জন্য কোনো পুরুষ একাধিকবার বিবাহ করতে পারতেন । বলা হয়েছে কোনো নারী একবার সন্তান প্রসব করে যদি আর না করে , আবার কোনো পত্নী বন্ধ্যা হলে , যার পুত্র জন্মগ্রহণ করেনি সেই পত্নীর স্বামী ৮ বছর অপেক্ষা করে পুনর্বিবাহ করতে পারতেন । আবার স্ত্রী মৃতবৎসা হলে তার স্বামী ১০ বছর অপেক্ষা করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতেন । তবে এক্ষেত্রে ঐ পত্নী কে যথোচিত ভোরণপোষন দিতে হত ।

বিবাহ বিচ্ছেদ : পুনর্বিবাহের বিষয়টি থেকে বোঝা যাচ্ছে সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ সমর্থন যোগ্য ছিল । অর্থশাস্ত্রের যুগে স্বামী স্ত্রীর সম্মতিক্রমে বিবাহ বিচ্ছেদ আইন সিদ্ধ ছিল । অর্থশাস্ত্রে সধবা , বিধবা নারীর পাশাপাশি বিবাহ বিচ্ছিন্না নারীর কথাও জানা যায় । স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি দ্বেষ বা আসক্তিহীনতা সত্য প্রমাণিত হলে তাদের

মোক্ষ বা বিচ্ছেদ সমর্থন করা হত । কিন্তু স্ত্রী কে যদি পতি ছাড়তে না চায় তবে স্ত্রী তার প্রতি দ্বেষপরায়ন হলেও বিচ্ছেদ হয় না । একইভাবে স্ত্রী ছাড়তে না চাইলে পতি চাইলেও বিচ্ছেদ সম্ভব হয় না । আট প্রকার বিবাহের মধ্যে প্রথম চার প্রকার ধর্ম্য বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদিত ছিল না । শেষ চার প্রকারের জন্য এটি প্রযোজ্য ছিল - ' অমোক্ষ্যা ভর্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্যা ভার্যায়শ্চ ভর্তা । পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ । স্ত্রী বিপ্রকারাদ্বা..... ধর্মবিবাহানামিতি ।'[২১] বিবাহ বিচ্ছেদের পর স্বামী স্ত্রীর ভোরণ পোষণের ব্যবস্থা করবেন এরূপ নিয়ম ছিল । স্ত্রীর দোষে যদি বিচ্ছেদ হয় তবে পতি স্ত্রীর থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য পতি ফেরত দিতে বাধ্য থাকতেন । কিন্তু পুরুষের দোষবশতঃ বিচ্ছেদ হলে পতির থেকে প্রাপ্ত দ্রব্য পতিকে ফেরৎ না দিলেও স্ত্রী মুক্ত হতে পারত ।

দণ্ড : পতি - পত্নী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যাভিচার কার্যে লিপ্ত হয় তবে উভয়ের সমান দণ্ড পেত । স্ত্রী কোনো অপরাধ মূলক কাজ করলে স্বামী তিরস্কার স্বরূপ তাকে কয়েকটি গালি দিতেন খুব বেশি হলে স্ত্রীর পিঠে বাঁশের ছাল বা দড়ি দিয়ে মৃদু প্রহার করতেন ।এর তুলনায় বেশি তিরস্কার করলে স্বামীকে বাক্ পারুষ্যের শাস্তি পেতে হত । স্ত্রীও স্বামীর অপরাধে অনুরূপ শাসন করতে পারতেন। এতে নারী পুরুষের সাম্যতা বজায় থাকত।[২২]

আধুনিক কালের বিবাহে অর্থশাস্ত্রের প্রভাব : বিবাহ একটি সামাজিক বন্ধন , যার দ্বারা নারী পুরুষ একে অপরের সাথে মিলিত হয়ে নতুন পরিবার গড়ে তোলে এবং নিজেদের সবরকম চাহিদা পূরণ করে । এর দ্বারা বংশ বিস্তার করে ও উত্তরাধিকারের সুযোগ সৃষ্টি হয় । অর্থশাস্ত্রে বিবাহ কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে বর্তমানেও তার একই অর্থ ও মূল্য রয়েছে । শুধু সময়ের সাথে সাথে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হওয়ায় বিবাহের ক্ষেত্রে সব নিয়ম সেই সময়ের মত দেখা যায় না , কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রের যুগে বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হলেও বর্তমানে সেই সবগুলো দেখা যায় না । বর্তমানে সর্বত্র কন্যা কে অলংকারাদি দ্রব্য সামগ্রী সহ বিবাহ দেওয়ার প্রচলন আছে । প্রাচীন কালে এটি- ই ব্রাহ্মবিবাহ নামে খ্যাত ছিল। তবে কোথাও কোথাও খুব কম জায়গায় শুল্কের বিনিময়ে কন্যা দান বা আসুর বিবাহের প্রচলন আছে । আবার প্রাচীন কালে যেটি গান্ধর্ব বিবাহ ছিল অর্থাৎ পিতা মাতার অনুমতি নিয়ে বা অনুমতি ছাড়াই নারী পুরুষ একে অপরকে পছন্দ করে বিবাহ করত - এই প্রকার বিবাহের প্রবনতা আজকাল খুব দেখা যায় । আবার সে সময়ে সমাজে যেরকম বিধবা বিবাহ, পুনর্বিবাহ , বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল বর্তমানেও এগুলিকে সমর্থন করা হয় । তবে পুনর্বিবাহ , বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে কৌটিল্য যে সব বিধিনিষেধ নির্দেশ করেছেন সেই সমস্ত নিয়ম বর্তমানে দেখা যায় না । অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রের যুগে নারী স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করে তারপর বিবাহ করত । কিন্তু বর্তমানে সেরকম কোনো নিয়ম নেই। কোনো নারী নিজের ইচ্ছানুযায়ী বিবাহ করতেও পারে আবার নাও করতে পারে । কেননা আধুনিক সমাজে নারীরা স্বাধীনভাবে কিছু করে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকাকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে । তবে কৌটিল্য নারীদের যে আইনগত সুযোগ সুবিধার কথা বলেছেন বর্তমানেও সেরকম বরং আরো বেশি সুবিধা দেখা যায় ।

উপসংহার : নারী পুরুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সারা জীবন একসাথে থাকার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় এবং বংশবৃদ্ধি করে । কৌটিল্যর অর্থশাস্ত্রে উক্ত বিবাহ ও বিচ্ছেদ সংক্রান্ত আইনগুলি সমাজেবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক অনবদ্য সৃষ্টি । বিবাহ সংক্রান্ত আইন গুলির দ্বারা মৌর্যযুগের সমাজ , আইন ব্যবস্থা , নিয়ম শৃঙ্খলার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে । সে সময়ে বিবাহ বিচ্ছেদ , পুনর্বিবাহ বিষয়ে সমর্থন করা হলেও সতীদাহ প্রথার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি । বরং বিধবা নারী কে তার ইচ্ছে থাকলে বিবাহের অনুমতি দেওয়া হত। বৈদিক যুগ থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কথা জানা গেলেও ধর্মশাস্ত্রগুলিতে, অর্থশাস্ত্রে নারীকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে । কৌটিল্য বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর জন্য সমান আইন বিধান করেছেন । এর থেকে সে যুগের নারী পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করে সাম্যতা বজায় রাখা হয়েছে সেটাই বোঝা যায় ।

নারী পুরুষের মধ্যে কোনো বৈষম্য না করা এই বিষয়টি বর্তমান কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । কৌটিল্য সেই বহু বছর আগে থেকে যে বিষয়টিকে সমর্থন করে এসেছেন বর্তমানে সেটিকে ফলপ্রসূ করার সবরকম প্রচেষ্টা চলছে । তাই কন্যাভ্রূণ হত্যা , পণপ্রথা , ধর্ষণ , নারী নির্যাতন এগুলি বন্ধ করার জন্য ভারতীয় সংবিধানে নানারকম আইন এর ব্যবস্থা রয়েছে । আবার নারীজাতির অগ্রগতির জন্য শিক্ষা , স্বাস্থ্য, কর্মক্ষেত্রে তাদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে । তৎকালীন সমাজের বিবাহ সংক্রান্ত এই আলোচনা থেকে সে সময়ে শাস্ত্রকাররা নারী পুরুষের মধ্যে সাম্যতা বজায় রাখার জন্য ভেবেছেন , নারীদের গুরুত্ব দিয়েছেন এটি স্পষ্ট ভাবে বোঝা যাচ্ছে এবং আধুনিক কালেও এই বিষয়টি অত্যন্ত যে গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচ্য গবেষণাপত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করা হয়েছে ।

তথ্যসূত্র:

১. অর্থশাস্ত্র ১/৭/২
২.মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়,'কৌটিল্যয়ম্ অর্থশাস্ত্র' , পৃ.১
৩.যাজ্ঞবল্কসংহিতা-মিতাক্ষরা-২/২১
৪.'অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ' - যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা- ২/২১
৫.bn.banglapedia.org.
৬.অর্থশাস্ত্র ৩/২/১
৭.কৃষ্ণদেব উপাধ্যায়, হিন্দু বিবাহ কি উৎপত্তি ঔর বিকাশ, পৃ.৩২
৮. পি.ভি.কানে, ধর্মশাস্ত্র কা ইতিহাস,পৃ.২৬৮
৯.মনুসংহিতা ৯/২৮
১০.অর্থশাস্ত্র ৩/২/১
১১.মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়,'কৌটিল্যয়ম্ অর্থশাস্ত্র' পৃ.৫৩১
১২.অর্থশাস্ত্র ৩/৩/১
১৩. 'এ্যষ্টবর্ষোऽষ্টবর্ষাং বা ধর্মে সীদতি সত্বর ' - মনুসংহিতা ৯/৯৪
১৪.অর্থশাস্ত্র ৩/২/৩
১৫.মনুসংহিতা ৯/১৯৪
১৬.অর্থশাস্ত্র ৩/২/৩
১৭.তদেব ৩/২/৬
১৮.তদেব ৩/৪/৯
১৯.মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়,'কৌটিল্যয়ম্ অর্থশাস্ত্র' পৃ.৫৫১
২০.অর্থশাস্ত্র ৩/৪/৭
২১.তদেব ৩/৩/৫
২২.মানবেন্দু বন্দোপাধ্যায়,'কৌটিল্যয়ম্ অর্থশাস্ত্র' পৃ.৭২৮.

গ্রন্থপঞ্জী :

উপাধ্যায়,কৃষ্ণদেব- *হিন্দু বিবাহ কি উৎপত্তি ঔর বিকাশ*, ভারতীয় লোক সংস্কৃতি শোধ সংস্থান, বারাণসী,১৯৮৪।
ওয়েস্টমার্ক, এডওয়ার্ড- *হিস্ট্রি অফ হিউম্যান ম্যারেজ*, কেসেনগার পাবলিশিং, নিউইয়র্ক,২০০৩।
কানে,পি,ভি- *ধর্মশাস্ত্র কি ইতিহাস*, হিন্দু সমিতি, উত্তরপ্রদেশ,১৬০০।
বন্দোপাধ্যায়,নারায়নচন্দ্র-*মৌর্য যুগের ভারতীয় সমাজ*, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,১৯৪৫।
বন্দোপাধ্যায়,মানবেন্দু(সম্পা.)-মনুসংহিতা ,সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,১৩৯৭ বঙ্গাব্দ।
বন্দোপাধ্যায়,মানবেন্দু(সম্পা.)-*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র*(১ম খণ্ড),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা,২০১০।

বসাক, রাধাগোবিন্দ (সম্পা.)-*কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র*(১ম খণ্ড), জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,১৯৮৯।

ভট্টাচার্য, সুকুমারী-*প্রাচীন ভারতের সমাজ ও সাহিত্য*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৩৩৪ বঙ্গাব্দ।

রায়,কুমুদরঞ্জন(সম্পা.)-*যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার,কলকাতা,১৯৪৬।

সেন, সুব্রতা-*পণপ্রথা শাস্ত্রে ও সমাজে*,আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা,১৯৯৮।